বিমল চক্রবর্তী

অপরাজিতা রায়ের ছোটগল্পের কথাকল্প

১৯২৯ সাল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে জনসভায় গান্ধীজী বিলাতী কাপড়ের স্তুপে আগুন ধরিয়ে নতুন করে বয়কট আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ৩২জন শীর্ষস্থানীয় শ্রমিক ও কমিউনিষ্ট নেতা কর্মীদের বন্দি করা হয়। ভগৎ ও বটুকেশ্বর দত্ত 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি তোলেন। তাঁদের দীপান্তর হল। ঐরকম ঝড়ো সময়ে, কমিউনিষ্ট বিপ্লবী ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়ের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করলেন সাহিত্যিক অপরাজিতা রায়। জন্মস্থান আসামের গুয়াহাটি। পরবর্তী সময়ে সমগ্র পরিবারটি ভারতের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ হন। আমরা জানি, ভারতের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি বা আর. সি. পি আই তৈরি করেছিলেন ১৯৩৪ সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সাম্যবাদী বিপ্লবী ও চিন্তাবিদ ছিলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। তিনি ছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক। তিনি ফরাসী, রাশিয়ান, জার্মান ভাষা জানতেন। 'ফ্যাসিজম' নামে জনপ্রিয় সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। সে অন্য কথা, অন্য ইতিহাস। অপরাজিতা রায়ের পরিবারের ঐতিহ্যগত ভিত্তি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ইতিহাসের কিছু তথ্য সূত্রায়িত করলাম।

অপরাজিতা রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর শান্তিনিকেতন থেকে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির হয়ে বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ এবং বঙ্গীয় সেবাদল সংগঠনে কাজ করার অপরাধে সাহিত্যিক অপরাজিতা রায় ১৯৫০ সালে Prevention Detention Act. এর অধীনে গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং এক বৎসর শিলং জেলে বন্দি থাকেন। ১৯৫২ সালে চলে আসেন আমাদের প্রিয় শহর আগরতলায়।

আগরতলা এসে শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। যোগ দেন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে। স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নেতাজীর ভাবশিষ্য সতীনাথ ভরদ্বাজ এবং হীরেন্দ্রনাথ নন্দীর স্বপ্নের স্কুলে কিছুসময় কাজ করার পর তিনি সরকারি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। যোগ দেন ধর্মনগর বি.বি.আই-তে। পরবর্তী সময় আগরতলার মেয়েদের স্বনামধন্য স্কুল মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করেন। কাজ

করেন ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবেও। সেসব অন্য জীবনের কথা। তার ব্যক্তিজীবনের কথা।

সাহিত্যচর্চা অপরাজিতা রায়ের পারিবারিক সংস্কৃতি। তার মাতৃপরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শৈশব থেকেই তাঁর কবিতা লেখার শুরু। তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ছোটদের 'পাততাড়ি' বিভাগে ১৯৩৯সালে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। এরপর কবি নরেন্দ্র দেব পরিচালিত 'পাঠশালা' মাসিক পত্রিকায় তার কবিতা নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে।

আগরতলায় আসার পর স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতে তার কবিতা প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি যুক্ত হন ত্রিপুরার সাহিত্য চর্চার প্রথম আলো বা প্রথম সংগঠিত শক্তি সাহিত্য বাসরের সঙ্গে। ১৯৭৪ সালে আগরতলায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদিকা ছিলেন তিনি। ২০০১ সালে তিনি রাজ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

লেখিকার প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাইরে বাউল' (১৯৭৬), 'সাহিত্যের বিবর্তিত বাস্তব' (১৯৮৩), 'ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা' (১৯৮৬), 'নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৭), 'এখনো অন্ধকার' (১৯৮৯), 'দ্বিতীয় শরীর' (২০০০), 'নির্বাচিত ছড়া' (২০০৬), 'নারী: ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক সংখ্যালঘুতা (২০০৭), 'একক পাঠে ত্রিপুরার সাহিত্য সন্ধান' (২০০৮), 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (২০১৬)। আমরা এখানে কথা বলবো ছোটগল্পকার অপরাজিতা রায়কে কেন্দ্র করে।

সমালোচনা সাহিত্যের আলোকে আমরা জানি, ছোটগল্প উনিশ শতকের নতুন ফসল। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার Washington Irving এর 'Sketch Book of geology Crayon'-এর প্রকাশ কালকেই সার্থক রূপ ও আঙ্গিক যুক্ত আধুনিক ছোটগল্পের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোকে আমরা বলতে পারি, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' হল প্রথম সার্থক ছোটগল্প। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'আদরিণী' হল বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সার্থক ছোটগল্প। সূচনাপর্বকে বাদ দিলে, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার সূচনাপর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি ঘটেছে অসমান্তরাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রাজশেখর বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবোধ ঘোষ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যেমন এক্ষেত্রকে বিকশিত করেছেন, তেমনি বিকশিত করেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার, গোপাল হালদার, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য,

সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সোমেন চন্দ, বিমল কর, ননী ভৌমিক, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, অসীম রায়, কার্তিক লাহিড়ী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, তপোবিজয় ঘোষ, হাসান আজিজুল হক, রমানাথ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সুবিমল মিশ্র, শৈবাল মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, জয়া মিত্র, মীনাক্ষী সেন, সেলিনা হোসেন, আবুল বাসার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিতা অগ্নিহোত্রী, বিমল চৌধুরী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, কালিপদ চক্রবর্তী, মানস দেববর্মণ, নবারুণ ভট্টাচার্য, ঝুমুর পাণ্ডে, জাকির তালুকদার, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, বিমল সিংহ, মানিক চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, দেবব্রত দেব, দীপক দেব, সমরজিৎ সিংহ, কিশোররঞ্জন দে, দুলাল ঘোষ, জয়া গোয়ালা, প্রদীপ সরকার, অরুণোদয় সাহা, শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ-রা।

ত্রিপুরার বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসও ৯০ বৎসর পেরিয়ে গেছে। আখ্যান শিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ত্রিপুরার গল্প বলতে আলাদা ভাবে কী বুঝব আমরা ? যাঁরা নিছক ভৌগোলিক অঞ্চল ত্রিপুরায় থাকেন, তাঁদের বাংলা গল্প - নাকি ভিন্নমাত্রিক কোনো স্বাতন্ত্র্য, যা বাংলা ভাষায় লিখিত ? অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্য বা ব্রিটেনের লেখালেখি একই ইংরেজী ভাষা হলেও সমাজ ও আঞ্চলিক ভিন্নতায় যেমন পৃথক, ত্রিপুরা তথা উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা গল্পের এমন তুলনায় কেউ-কেউ হয়তো ভুরু তুলতে পারেন। পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ ও উত্তরপূর্ব ভারতের ২৫ কোটি বাঙালি পাঠকের কাছে অসীমান্তিক চেতনায় ত্রিপুরার গল্পের স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে।" নয়নতারা, বিষকরবী, ছায়া জীবন, বুড়ো দেবতার মাচান অন্য আখ্যানের স্বর বয়ে আনে বাংলা সাহিত্যে।

এই স্বরকেই সম্প্রসারিত করেছেন ছোটগল্পকার অপরাজিতা রায়। ৪০-৫০-এর দশকে অজিতবন্ধু দেববর্মণরা যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজেরই সহযোদ্ধা অপরাজিতা রায়। অপরাজিতা রায় মূলত কবি। তিনি ছড়াকারও। ত্রিপুরায় সমালোচনা সাহিত্যের কাণ্ডারী তিনি। তাঁর ১২টি ছোটগল্পের কথা আমরা পাঠ-প্রতিক্রিয়ার আলোকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছি। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো অপরাজিতা রায়ের গল্প সংকলন 'এখনও অন্ধকার'। ১১টি গল্পের সংকলন ছিল সেটি। পরবর্তী সময় কল্যাণী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পাঁচ প্রজন্মের নির্বাচিত ৫৬জন লেখিকার গল্প সংকলনে আমরা পাই লেখিকার অন্যতম গল্প 'দরজা খুলতে দেরী'।

দিন-রাত্তির এক চাকাতেই বাঁধা:

'দিন-রাত্তির এক চাকাতেই বাঁধা' গল্পটি বাড়িতে বাড়িতে কাজ করা এক সর্বহারা শ্রমজীবী মহিলার গল্প। মহিলার নাম মালতী। আমাদের রাজ্যে প্রায় ৪লক্ষ ৪৯হাজার নারী দিনমজুর শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ৭৮ ভাগ বাড়িতে বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করেন। সমস্ত পৃথিবীতে ৬৭.১ মিলিয়ন বাড়ির কাজের লোক আছে। এটা আই. এল. ও-এর ২০১৬

সালের সমীক্ষা। এর মধ্যে একটা বিরাট অংশ শিশুশ্রমিক। সমস্ত পৃথিবীতে অসংগঠিত শ্রমিকক্ষেত্রের মধ্যে 'কাজের মাসি' তকমাধারী এই 'ডমেস্টিক সারভেন্ট' এর আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই ভয়াবহ। 'এখনও অন্ধকার' গ্রন্থের 'দিন-রাত্তির এক চাকাতেই বাঁধা' গল্পটি এই ভয়াবহতার টুকরো টুকরো অংশই তুলে ধরেছেন লেখিকা অপরাজিতা রায়। তার গল্পের প্রধান চরিত্র মালতী দিনে তিন বাড়ি কাজ করে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু করে দৌড়। দুই সন্তানের মা মালতী। তিন নম্বর বাচ্চা পেটে। না খেয়ে ইঁদুর দৌড় দৌড়ায়। পেটে কিল মেরে দৌড়ায়। কারন তিন বাড়ির মধ্যে সকালে প্রথম দু'বাড়িতে কিছু খাওয়া দেয়না। মালতীও চায় না। চাইতে কেমন বিতৃষ্ণা লাগে। কেমন যেন ভিক্ষে ভিক্ষে মনে হয়। লেখিকার ভাষায়—"....অমন ঊর্ধ্বশ্বাস কাজের মধ্যে খাওয়ার কথা ঠিক মনেও পড়ে না"।

এইতো আমাদের দেশ। ভয়াবহ ক্ষুধা ও দরিদ্রতা। ক্ষুধা ও দরিদ্রতার আলোকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে এরকম ১১৯টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ১০০তম। আমরা ভালো নেই ক্ষুধা ও দরিদ্রতার আলোকে। ভালো নেই অপরাজিতা রায়ের মালতীরা। রাষ্ট্রসংঘের সনদে সদস্য দেশগুলির এই সংকল্পের ঘোষণা ছিল যে "মানুষের মৌলিক অধিকারে আমরা আবার আস্থা প্রকাশ করি, আমরা আস্থা প্রকাশ করি মানুষের শারীরিক মর্যাদায় ও মূল্যে, এবং পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারে....।" গণতন্ত্রের নীতি হল প্রতিটি মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা। কিন্তু এসব বিষয় সবই অবান্তর মনে হয় অপরাজিতা রায়ের 'দিন রাত্তির এক চাকাতেই বাঁধা' গল্প পাঠ-পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে। তবুও আশা করব একদিন না একদিন মালতীরা জেগে উঠবেই। রুখে দাঁড়াবেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

মাথা তোলার আগে :

'মাথা তোলার আগে' ইটভাঙা মহিলা শ্রমিকদের গল্প। ত্রিপুরা শ্রম দপ্তরের এক আধিকারিককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ত্রিপুরার ইটভাঙা শ্রমিকের সংখ্যা এখন কতো? তার মধ্যে পুরুষ মহিলার সংখ্যার বিন্যাসই বা কীরকম? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন , উত্তর জানা নেই। পরিসংখ্যান নেই। সুনির্দিষ্ট সার্ভেও হয়নি—এসংক্রান্ত। কিন্তু তিনি একথা বলেছিলেন মেসিনে চিপ্‌স ভাঙা শুরু হওয়ায় তারা ভালো নেই। তারা এখন অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। অপরাজিতা রায়ের গল্প 'মাথা তোলার আগে'-র নায়িকা হলেন লছমনীর। তাদের আদিনিবাস বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায়। কিন্তু কোনও ধারনা নেই লেট পূর্ব-পুরুষের বাসস্থান দ্বারভাঙ্গা জেলা সম্পর্কে। লছমীর ত্রিপুরাতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। বিয়ে হয়েছে হীরালালের সঙ্গে। কবে তার বাপ কিংবা তারও বাপ বিহার ছেড়ে ত্রিপুরায় এসেছিল, জানেনা হীরালাল। তারা হিন্দী বাংলা মেশানো ভাষায় কথা বলে।

লছমনীয়া বাচ্চার নাম রেখেছে জহরলাল। হীরালালের ছেলে মোতি আর জওহর। অসাধারণ জীবন সংগ্রামের গল্প 'মাথা তোলার আগে'। গল্পটি শেষ হয় বড়ো চমৎকার ভাবে।

সাব-অলর্টান মানুষের গল্পে এর থেকে ভালো প্রতিবাদী ঢঙ আর আমাদের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব বলে মনে হয় না। লেখিকা লিখেছেন— "লছমনীয়া পাথর ভাঙা ভুলে জহরলালকে বুকে চেপে ধরে ভাবে, ইন্দিরাজীর বাপের নামে নাম রেখেছে ছেলের। সে কি বড় হয়ে তাদের মুখে আটকে থাকা প্রতিবাদের আগল খুলে দিতে পারবে? গোর্কীর পাভেলের নাম সে শোনেনি। কে তাকে শোনাবে?" প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষদের কথা কে শোনাবে? সত্যিই এ প্রশ্ন আমাদের দেশে এখনও প্রাসঙ্গিক।

রুদ্ধ বসন্ত:

'রুদ্ধ বসন্ত' দাঙ্গার গল্প। ১৯৮০ সাল। জুন এবং জুলাই মাস। ত্রিপুরায় দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হল। ত্রিপুরার গণমানুষ দেখল মান্দাই গণহত্যা। হদ্রার হত্যালীলা। স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক কার্তিক লাহিড়ী 'এই আমার দেশ' কবিতায় লিখলেন,

"জন্মানো কি অপরাধ এই দেশ ঘরে
আকাশ মাটিতে আর
টিলায় লুঙ্গায়
যেখানে নীড়ের শান্তি ঝরে অবিরাম।

... একই মানুষ তবু কেন ব্যবধান
জন্মভূমি এক এই টিলায় লুঙ্গায়
আমার শোণিতে
ওঠে
যেই কলতান
কাঁঠালিয়া লক্ষীছড়া
বোরাখা
কুলাই
হালাহালি হাচুপাড়া
ডম্বুর সিধাই
দূর কাছে ধ্বনি ওঠে
জম্পুই শাখানে
.... উনপঞ্চাশী বাতাসে কেন তপ্ত হও
ফেরাবে কি হাত প্রাপ্য শান্ত স্নিগ্ধ মনে"

'রুদ্ধ বসন্ত' গল্পের মূল চরিত্র বিমলা। গল্পকার লিখেছেন—"জুনের দাঙ্গায় বিমলার স্বামী মারা গেছে। জুনের দাঙ্গা, আশি সালের জুনের দাঙ্গা ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি দগদগে ঘা। এই ঘায়ের যন্ত্রণা সারা দেশের কাছে ত্রিপুরাকে বিশেষভাবে পরিচিত করেছিল। ছুটে

এসেছিল কত জন কত দিক থেকে। কোথায় পড়েছিল ত্রিপুরা, ভারতের কোন এক কোনায়, অনেকেই জানত না, মাথা ঘামাত না ত্রিপুরার সমস্যা নিয়ে। এই ধাক্কায় ত্রিপুরা কাগজের শিরোনামে উঠে এল, সবাই চিনল তাকে। বিশেষ করে যেখান থেকে গায়ের কোপটা শুরু, সেই মান্দাই নামের জায়গাটাকে। ছোট্টো টিলা ঘেরা একটা গ্রাম, রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় মাইল কুড়ি-বাইশ দূরে, যেখানে সবুজ শান্ত পরিবেশে মানুষ বাস করেছে বছরের পর বছর নিরুদ্বেগে, নিজেদের সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে। সেখানেই হঠাৎ ১৯৮০ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে যায় অকল্পনীয় বিদ্বেষ। সেই মান্দাই বাজারে ছিল বিমলার স্বামীর দোকান, ছোটো মুদির দোকান। পেছনে ছোটো দুটো ঘরে ওদের ছোট্টো সংসার। বিয়ের মাত্র বছরখানেক হয়েছিল। সেই বিভৎস দিনটার কথা মনে করতে চায়না বিমলা। ভুলে যেতে চায়, পারে না। ১৯৮০ সালের জুন মাসের ছয় কি সাত তারিখ হবে। পেটে তখন ওর বাচ্চা। ওর ঘাড়েও কোপ পড়েছিল। বাড়ির পাশের ঝোপে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল অজ্ঞান হয়ে। পরে পুলিশ এসে তাকে তুলে আনে। বেঁচেও যায়। বাঁচে ওর পেটের ছেলেটাও। তার প্রথম সন্তান, স্বামীর একমাত্র স্মৃতি। ....বিমলার তখন বয়স কতই বা, শ্বশুরবাড়ির সবাই বলতে লাগল কপাল পোড়া বৌ, অপয়া অলক্ষুণে বৌ, বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামীকে খেয়ে শেষ করল"

দাঙ্গা এইরকম ভাবেই বিমলাদের জন্ম দেয়। কবি চন্ডীদাস মধ্যযুগে উচ্চারণ করেছিলেন—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

লালন ফকির গেয়ে উঠেছিলেন—

"এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে"

তবুও মানুষ মানবজন্মের সার্থকতার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঙ্গা করে। দাঙ্গা হয়। বিমলাদের জন্ম হয়। সংকট তৈরি হয় মানব সভ্যতার।

সংবিধানের সেই ধারাটি:

সহকারী মহিলা নির্মাণ শ্রমিক কমলার গল্প 'সংবিধানের সেই ধারাটি'। কমলা স্বামী পরিত্যক্তা। যে তার পুত্র সন্তান মানিককে বড়ো করার জন্য ননী রাজনিস্ত্রীর দলে যোগালির কাজ নিয়েছে। যোগালির কাজ পেয়েই সে বেঁচে গেছে। একটা পেট তো নয়, সাত আট বছরের ছেলে আছে একটা। ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে, খোরাকীও বাড়ছে। আহা বাড়ুক, বালাই ষাট। কমলা ভাবে, ওর মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু নিয়ে বাঁচুক ওর মানিক। মানিকের মুখটা ভেসে উঠে চোখে। কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল। সাদা সরল দুটো চোখ মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল তার ছেলে মানিক।

মানিকের যখন চার বছর বয়স, মানিকের বাবা, বৌ ছেলে ফেলে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কমলা জানে না। খোঁজ করেছে ওর যথাসাধ্য। কোনও খবর পায়নি মানুষটার। আজ সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে —"কমলার হাতে একটা দশ টাকার নোট আর দুটো দু'টাকার নোট ফেলে দেয় ননী মিস্ত্রী। কমলা সেগুলোও যক্ষের ধনের মত আঁচলে বাঁধে। সারাদিনের ফসল তার। ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে দ্রুত পা চালায় ঘরের দিকে। বাজারটা ঘুরে যেতে হবে। ননী মিস্ত্রী যা দেয়, তাই ওদের প্রাপ্য বলে জানে কমলারা। একই দিনের কাজের জন্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে একই মজুরি নির্ধারিত হয়েছে সংবিধানে। কমলারা সে খবর রাখেনা। সংবিধানের কোন্ ধারায় নারী পুরুষের এই সমান মূল্য স্বীকৃত হয়েছে, কমলারা তা জানে না। আশেপাশের অনেক কিছুর মতই সংবিধানের সেই বিশেষ ধারাটিও অন্ধকারেই ঢাকা থাকে ওর কাছে, নারী-পুরুষের সম-মর্যাদার ব্যাপার তার কাছে স্পষ্ট নয়, তাই।

ভাল নামটা:

' ভাল নামটা' শিরোনামের গল্পটি চম্পার গল্প। চম্পকলতার গল্প। চম্পকলতা চম্পার ভালো নাম। চম্পার বাড়ি বড়দোয়ালী স্কুলটার পেছনে। সে বটতলা বাজারে ফুটপাতে বসে সব্জি বিক্রি করে। এটাই তার জীবিকা। জীবিকার ব্যস্ততার জন্য, প্রান্তিক সামাজিক অবস্থানের জন্য সে তার আসল নামটাই ভুলে গেছে। অথচ স্কুলে ভাল ছাত্রী ছিল চম্পা আরও অনেকের তুলনায়। এখন তার বাবা নেই। মা এখন ঠোঙা বানিয়ে, মুড়ি ভেজে সংসার চালায়। উঠোনে আনাজ লাগায় লাউ কুমড়ো কলা। বাজারে নিয়ে বেচতে হয় চম্পাকে। কে বেচবে না হলে? সুবল তো পড়ে, স্কুলে যায়। মা রান্না করে, ঠোঙা বানায়, মুড়ি ভাজে, ছোটো ভাই ধবল তো মাত্র চার বছরের, তাকে দেখে রাখতে হয় মার। কাজেই ফাইভ পাশ করে চম্পাকে পড়া বাদ দিতে হয়েছে।

গল্পের শেষে লেখিকা আমাদের দেশের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ফারাক বুঝানোর জন্য বাস্তব চিত্রকল্প তুলে ধরতে গিয়ে লেখেন— "রেডিয়ো বাজছে পাশের দোকানে। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। রেডিয়ো বাজছে, চম্পা মন দিয়ে শুনে রেডিয়োর খবর। জাতীয় শিক্ষানীতিতে মেয়েদের শিক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কোন মন্ত্রী যেন মিটিং-এ কোথায় বক্তৃতায় একথা বলেছেন, তার খবর বলে চলেছে রেডিয়ো। স্ত্রী শিক্ষার নতুন কর্মসূচী, বড় পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। চম্পা ওর সামনে ছড়ানো সব্জিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে শোনে সে সব কথা।"

বাঁপ কেন বাঁচল না:

'বাপ কেন বাঁচল না' গল্পটি 'মিনুর মাসি'-র গল্প। পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমান অধিকারের গল্প। মিনুর মাসি পুকুর পাড় থেকে হেলঞ্চা তুলে বাজারে বিক্রি করে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে সর্ব অর্থেই সর্বহারা। ভূমিহীনও সে। বসতভিটেও নেই তার।

'মিনুর মাসি'-র গল্প লিখতে গিয়ে লেখিকা লিখছেন—"এসব সেই কবেকার কথা। এখন নাকি আইন বাপের জমি জেরাত বিষয় সম্পত্তির ভাগ মেয়ে সন্তানও পাবে।" মিনুর মাসি একথা শুনেছিল একটা মিটিং-এ। মেয়েদের একটা সভা হয়েছিল এখানে ঐ টাউন হলে। অনেক বড় বড় মহিলা সব এসেছিলেন বাইরে থেকে গাড়ি করে। মাইক বাজিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। মেয়েদের নাকি নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার, নিজের হক নিজে বুঝে নেবার সাহায্য দরকার। অনেক আইন-কানুনের কথাও তাঁরা বলেছিলেন। সব বোঝেনি মাসী। মনেও নেই সব কথা, শুধু ঐ কথাটাই মনে গেঁথে আছে, বাপের বিষয়-আশয়ে মেয়েদের ভাগ আছে। তারা ফেলনা নয়, বানের জলে ভেসে আসেনি। মাসী জানে ভাল করেই,ওর জীবনে ঐ আইনের আর কোনও মানে নেই। তবু মনে হয়, বারবার মনে হতে থাকে, হেলঞ্চা শাক, বাঁশের লাঠি, পুকুরের জল সবকিছু আরও ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায় ওর চোখে, শুধু মনে হতে থাকে, বাবা যদি আরও কিছুদিন বাঁচত, ঐ আইনটা চালু হওয়া পর্যন্ত, যদি বেঁচে থাকত বাবা, বাঁচতে তো পারত, এমন কিছু থুথথুরে বুড়ো হয়ে তো বাবা মরেনি, বাঁচতে পারত আইনটা চালু হওয়া পর্যন্ত, যদি বাঁচত তাহলে তো এমন হেলাফেলায় বোনপোর বাড়ি তার দিন কাটাতে হত না। ভায়েদের মত তারও অনেক থাকত পায়ের নীচে শক্ত মাটি, নিজের একটুখানি ভিটে। এই ভিটেটুকুর জোরেই যে মানুষের মত বাঁচতে পারত সকলের সঙ্গে।

কৃষ্ণকলি:

'কৃষ্ণকলি' গল্পটি মাধুরী নামক এক মেয়ের গল্প। গায়ের রং কালো বলে মাধুরীর আজ তিরিশ বছর বয়সেও বিয়ে হয়নি। তার এক ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে গায়ের রং ফর্সা বলে। আবহমানকাল ধরে নারী অবয়বের সৌন্দর্য একটি বহু চর্চার বিষয়— মানুষের মনে, সাহিত্যে। বিষয়টির সমাধান হয়নি। নারীর জন্ম রহস্য, তার দেহের খুঁটিনাটি গঠন সমাজ বুঝতে চায় না। অনেকেই স্বপ্নের কথামালা সাঁজিয়েছেন। যেমন এক কবি লিখেছেন —

"আমরা চালাই ঘর সংসার বাজার
আমরাই বুনি নকশিকাঁথার পাড়
...আজ আমাদের সমানাধিকার পালা
আমরা গড়ব আমাদের সংসার
ভালবাসা দিয়ে শাসন করব আর
মাথা নোয়াব না কারও কাছে বারবার।"

কিন্তু সমাজের চাপ তাদের মাথাকে নুইয়ে দেয়। কিন্তু নুইয়ে না দেওয়ার গল্প হলো 'কৃষ্ণকলি'।

মেনে নিতেই হল:

দীপেন ও দীপ্তির গল্প 'মেনে নিতে হল'। দীপ্তিকে ঘরে রেখে তার মায়ের উৎসাহে দীপেন দ্বিতীয় বিয়ে করে। ডিভোর্স ছাড়াই। পিতৃতন্ত্রের বলি হল দীপ্তি। সতীন জ্বালা থাকলে পরও

দীপ্তি ভাত-কাপড়ের জন্য মুখ খোলে না। রাধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাধা এই চাকাতেই বাঁধা পরে যায় দীপ্তি। নারীর নিজস্ব দুঃখের বর্ণমালা বা আখ্যান ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

পণ নেব না, চাকরী নেব:

পণ প্রথার বিরুদ্ধে এ গল্প এক বাস্তব সম্মত আখ্যান তুলে এনেছে। প্রদীপ গল্পে আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ হতে গিয়েও সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে নিজেকে নির্মাণ করতে পারলো না সামাজিক সীমাবদ্ধতার জন্য। লেখিকা লিখছেন— "মেয়ে- বাতিলের কয়েকটা ঘটনা থেকে একটা জিনিষ কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রদীপের বাবা মা এখন চাকুরে মায়ের দিকে ঝুঁকেছেন। পণে প্রদীপের আপত্তি, চাকরিতে তো নয়। চাকরি তো মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপার। চাকুরে মেয়ে বিয়ে করতে বাধা কী? বাপ মাও বুঝেছেন, বিয়ের পর পণের কয়েক হাজার নগদ টাকার চাইতে, সারাজীবন ধরে উপার্জন, সে তো অনেক বেশি লাভের।"

কথা বলা বারণ ছিল:

'কথা বলা বারণ ছিল' গল্পে লেখিকা লিখছেন—"একরকম পাখি আছে, তারা তাদের ডাকের মধ্য দিয়ে খুব করুণ সুরে যেন বলে, 'কথা বোলো না'। এরা নাকি মেয়েদের কথা বলতে বারণ করে। কথা বলে একবার দুটি মেয়ে বিপদে পড়েছিল, সে বিপদ থেকে আর উদ্ধার পায়নি হতভাগিনীরা। তারই স্মৃতি যেন বয়ে বেড়ায় এই পাখি তার ডাকের মধ্য দিয়ে। ইতিহাস যাদের কথা লিখে রাখেনি, সমাজ যাদের কথা মনে রাখেনি,মানুষ সাড়া দেয়নি যাদের ব্যথায়, তারা যেন প্রকৃতির কোলে পাখির ডাকের মধ্যে বিছিয়ে রেখে গেছে তাদের কান্নার সুর।"

'কথা বলা বারণ ছিল' গল্পটি মেয়েদের দুঃখ যন্ত্রণার সামাজিক ইতিহাস রূপকথার আখ্যানের আলোকে লেখিকা কবিতার চেতনা সহ তুলে এনেছেন। প্রতিবাদের অন্য ভাষা নির্মাণ করেছে 'কথা বলা বারণ ছিল' গল্পটি।

শেষ বয়সের সংগ্রাম:

'শেষ বয়সের সংগ্রাম' গল্পটি এক বৃদ্ধা মহিলার জীবন সংগ্রামের গল্প। ঐ সংগ্রামী মহিলা শেষ বয়সে এক অকল্পনীয় সংগ্রামী ভুমিকা নেয়। বিধবা নাতবৌকে নিরামিষের যাবজ্জীবন কারাবাস থেকে মুক্তি দেয়। এই মুক্তি দেওয়ার গল্পই 'শেষ বয়সের সংগ্রাম'।

দরজা খুলতে দেরি:

একটি সামাজিক সমস্যার গল্প 'দরজা খুলতে দেরি'। সমস্যাটির কথা শুনুন লেখিকার ভাষায়—"কোথাও বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ একটাই, সে মুসলমান। কিন্তু এভাবে আর ক'দিন চলবে? ভেবে পায় না আজিজ। রেহানা আর বাচ্চাটাকে একা হোটেলে রেখে আসা কতটা নিরাপদ? দীর্ঘ দিন, সেটাও প্রশ্ন।..... রমাদেবী ভাবলেন কতটুকু এগিয়েছেন? গত শতাব্দীর অন্ধকারেই তো দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু তিনি একা নন, বেশির ভাগ মানুষই।

এখানে সরকারী কলেজে মুসলিম ছেলেদের জন্য আলাদা হোস্টেল রয়েছে, নজরুল ছাত্রাবাস নামে। আগে সকলে একসঙ্গে থাকত, এখন পারে না। পাঁচিল উঠেছে একটার পর একটা। ধর্ম শুধু পাঁচিলই তুলছে। মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করতে ধর্মের মত ক্ষমতাবান আর কোনো কিছুই নয়।" শেষদিকে গল্পে আশার আলো ফুটিয়ে দেন লেখিকা। "পূর্বদিকে আলো ফুটে উঠেছে। সেদিকে আরও কতক্ষণ চেয়ে রইলেন। সূর্যের উত্তাপ গায়ে লাগছে। জোর পাচ্ছেন শরীরে মনে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিতে পারবেন।"

সবমিলিয়ে আপরাজিতা রায়ের ছোটগল্প মানে সামাজিক সমস্যার ছোটগল্প। সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রিয় ভাবনা হিসাবে তার আখ্যানগুলোতে উঠে এসেছে সমাজে নারীর স্বাধিকার সচেতনতার প্রতিষ্ঠা প্রবণতা। কেউ কেউ বাঁকা চোখে যাকে বলেন নারীবাদ। সবমিলিয়ে অপরাজিতা রায়ের ছোটগল্প মানে মেয়েদের কথাকল্প। নৈতিকতা ও নারীবাদের আলোকে সামাজিক প্রেক্ষিতের নানা দিক উঠে এসেছে তার গল্পে। কবি ও বিপ্লবী সরোজ দত্ত 'বর্তমান বুদ্ধিজীবির প্রতি' কবিতায় লিখেছেন—

"তোমার বুদ্ধির সুধা সুরা হল
আঁধারে পরিচয়।"

লেখিকা অপরাজিতা রায়ের বুদ্ধির সুধা আঁধারে পরিচয় সুরা হয়নি। তিনি আমাদের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। কারণ তিনি জানেন—

"কথা যে কহিতে পারে সে যদি না কহে কথা,
মৌন রহে মূঢ় অহংকারে
তাহার বুকের মাঝে
পচিয়া কথার সড়া
বীজাণু ছড়ায় চারিধারে"।